বন্যার স্রোতে-ভাসা কুটার মত সহায়-সম্বলহীন একটি ছেলে তখন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ছেলেটির নাম ভবতোষ।

অপরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া যেখানে যতদিন থাকা চলে, ভবতোষ সেখানে ঠিক ততদিনই থাকে, তাহার পর আবার কোথায় কোন্‌দিক দিয়া চলিয়া যায় কেহ কিছু জানিতেও পারে না।

অনাহারে অনিয়মে শরীরটা তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথাই, কিন্তু অসুখে পড়িলে দেখিবার কেহ নাই বলিয়াই বোধ করি স্বাস্থ্য তাহার সহজে ভাঙ্গে না। নিটোল সুন্দর দেহের গড়ন, ভাসা ভাসা দুটি চোখ,—মুখখানি দেখিলেই মমতা হয়।

বাড়ীঘর যে তাহার একেবারেই নাই তাহা নয়। বীরভূম জেলার কোন্ এক অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে থাকিবার মত মাটির একখানি কোঠাবাড়ী তাহার এখনও আছে।

সেইখানেই তাহার জন্মস্থান এবং শুধু জন্মস্থান নয়, শৈশব হইতে দশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার সেইখানেই কাটিয়াছে।

ভবতোষের মনে পড়ে, বাল্যকালে অভিভাবিকা বলিতে বিধবা মা ছাড়া আর কেহই তাহার ছিল না।

মনে পড়ে, পল্লীগ্রামের দুরন্ত শীতের সন্ধ্যায় সারা গ্রাম যখন নিস্তব্ধ হইয়া যাইত, আর সেই শব্দহীন পল্লী-প্রান্তরে থাকিয়া থাকিয়া শৃগালের ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যাইত না, সেই সময় লেপের তলায় মায়ের কোলের কাছটিতে শুইয়া ভবতোষ বলিত, 'মা একটি গল্প বল।'

মা তাহার কোনদিন গল্প বলিতেন—রাজা আর রাজকন্যার গল্প, রাক্ষসী আর রাজপুত্রের গল্প! আবার কোনদিন বলিতেন তাহাদের সুখ দুঃখের কাহিনী। বলিতেন—কেমন করিয়া তাহার বাবা মারা গেলেন, কেমন করিয়া কি কষ্টে তাহাদের দিন চলিতে লাগিল, তাহার পর কেমন করিয়া তাঁহার এই একমাত্র পুত্র ভবতোষের মুখ চাহিয়া তিনি বাঁচিয়া আছেন, ইত্যাদি।

ভবতোষের বয়স তখন নয় বৎসর অতিক্রম করিয়া দশে পড়িয়াছে। দশবৎসরের জীবনে তাহার কতটুকুই-বা অভিজ্ঞতা! তবু সে ভাবিত—বড় হইয়া তাহার এই দুঃখিনী মায়ের দুঃখ সে যেমন করিয়াই হোক্ ঘুচাইয়া দিবে, মাকে সুখে রাখিবে।

ভবতোষ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিত, 'মা আমি বড় হয়ে এই এ-ত এ-ত টাকা আনবো।'

মা'র চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিত। বলিতেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার বিয়ে দেবো, রাঙা টুক্‌টুকে বৌ আসবে। আমার এই একপাশে শুয়ে থাকবে তুমি, আর একপাশে শুয়ে থাকবে তোমার বৌ।'

এমনি করিয়া এই দুই মাতা-পুত্রের মনের আকাশে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল যখন আশার রঙে রঙিন্ হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা ভবতোষের মা গিয়াছিলেন খিড়কির পুকুরে কাপড় কাচিতে, ফিরিয়া আসিয়াই উঠানের উপর চীৎকার করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

ভবতোষ ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'লো মা?'

মা বলিলেন, 'কি জানি বাছা, অন্ধকারে পায়ে আমার কিসে যেন কাম্‌ড়ে দিলে। মনে হ'লো যেন একটা সাপ।'

মা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন,—'জ্বলে গেল! সারা গা আমার জ্বলে গেল!'

নিরুপায় বালক মার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া পাশের বাড়ীর পরেশকাকাকে ডাকিতে গেল।

সংবাদ পাইবামাত্র পরেশকাকা ছুটিয়া আসিলেন, দলু আসিল, মাণিক আসিল, রসিক আসিল, লালপুরের খুড়ী আসিল, টেবী

আসিল, পুঁটি আসিল, মেজবৌ আসিল, পাড়াপড়শী অনেকেই ছুটিয়া আসিয়া ভবতোষদের উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন। চিকিৎসার চেয়ে গোলমাল বেশি হইল, লোকজন সব লণ্ঠন লইয়া লাঠি লইয়া সাপটাকে সর্ব্বাগ্রে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, মেয়েরা খানিক্ হায় হায় করিল এবং অনেকক্ষণ পরে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা পরামর্শ ও আলোচনার পর পাশের গ্রাম হইতে যখন রোজা ডাকিতে পাঠানো হইল, ভবতোষের মা তখন একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন। কয়েকজন মেয়ে তাহাকে অতিকষ্টে ধরাধরি করিয়া উঠান হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজেতে শোয়াইয়া দিল।

ভবতোষ তাহার মায়ের শিয়রের কাছটিতে হেঁটমুখে বসিয়া বসিয়া কতবার যে 'মা মা' বলিয়া ডাকিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যতক্ষণ চৈতন্য ছিল, মা তাহার সাড়া দিয়াছিলেন. চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। চোখ দিয়া জলও পড়ে না, সাড়াও দেন না!

ভিন্ন গ্রাম হইতে রোজা আসিল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। এদিকে তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তবু সে চেষ্টার ত্রুটি করিল না, কতরকমের কত মন্ত্র বলিল, ক্ষতস্থানটাকে কাটিয়া চিরিয়া ঔষধ লাগাইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

রোজা বলিল, 'কালে কেটেছে বাবু, এ হাতের বাইরে চলে গেছে।'

এই বলিয়া সে লাশ জ্বালাইয়া দিবার হুকুম দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু রোজার হুকুমে কাজ চলিবে না, গ্রামের মুরুব্বি মাতব্বরেরা বলিতে লাগিলেন, পুলিশের হুকুম চাই।

সাপে কামড়ানো মানে অপমৃত্যুর মড়া, পুলিশের হুকুম না পাইলে লাশ জ্বালানো চলে না। মৃতদেহের আপাদমস্তক সাদা একটা চাদর দিয়া ঢাকিয়া গ্রামের প্রেসিডেণ্ট্ পঞ্চায়েৎ রতন চৌধুরী থানায় একজন চৌকিদার পাঠাইয়া দিলেন। আর একজন চৌকিদার বসিয়া রহিল মৃতদেহ আগ্লাইয়া।

এমন মর্ম্মান্তিক ভাবে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় বালক ভবতোষের দশ বৎসরের জীবনে এই প্রথম। বাবার মৃত্যু তাহার মনে পড়ে না, গ্রামের আরও দু'একজনের মৃত্যু যে সে না দেখিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু এমন করিয়া এক নিমিষে মানুষ যে মরিয়া যাইতে পারে—কোনদিনই সে তাহা ভাবিতে পারে নাই।

ভবতোষ 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিল না, শুধু দেখা গেল তাহার দু'চোখ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে, কাপড়ের খুঁটে মুছিয়া ফেলিতেছে, আবার গড়াইতেছে।

পাশের বাড়ীর লালপুরের খুড়ী তাহার হাতে ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, 'আহা, বাছা আমার! বাপ্‌টিও গেল, মা'টিও গেল।'

এম্‌নি করিয়া যে আসে, সেই একবার করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা

দিতে থাকে। ভবতোষের সে সব ভাল লাগে না। মনে হয় সেখান হইতে ছুটিয়া পালায়। অথচ পালাইতেও পারে না।

থানা হইতে দারোগাবাবু আসিলেন রাত্রে। গ্রামের মধ্যে একটা বিভ্রাট বাধিয়া গেল। দারোগাবাবু ডাকাডাকি করিয়া বহু লোক জড়ো করিয়া ফেলিলেন। মৃতদেহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাকে উহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া করিয়া অনেকক্ষণ পরে তিনি স্থির করিলেন মেয়েটা সত্য-সত্যই সাপের কামড়ে মরিয়াছে, সুতরাং অনর্থক আর মৃতদেহটা মর্গে চালান্ দিয়া লাভ নাই,—উহার সংকার করিয়া দেওয়াই উচিত।

হুকুম দিয়া দারোগাবাবু থানায় ফিরিয়া গেলেন। এদিকে গ্রামের মধ্যে বাধিল আর-একটা গোলমাল। একে ত' সর্প দংশনে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহাদের মৃতদেহ নাকি দাহ করিতে নাই, তাহার উপর এই রাত্রির অন্ধকারে অপমৃত্যুর মড়া কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে হইলে গ্রামের কয়েকজন ছোকরা বলিয়া বসিল—এমন একটা বস্তু তাহাদের প্রয়োজন যাহার কল্যাণে অন্ততঃ ভূত-প্রেতের ভয়টা তাহাদের মন হইতে দূরীভূত হইয়া যায়।

শেষ পর্য্যন্ত সবই হইল। ভবতোষের হইয়া প্রতিবেশী রতন চৌধুরী টাকা দিলেন।

উন্মত্ত জনতা কোমরে গামছা বাঁধিয়া মহা উৎসাহে হৈ হৈ করিয়া ভবতোষের মাকে শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য উঠানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল

পুরোহিত বলিলেন, 'থামো, অত বড় ছেলে রয়েছে, মুখাগ্নি করতে হবে।'

ভবতোষ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ডাকিবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মার মরা মুখে আগুন দিয়া অন্ধকার গাছের তলায় সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—মা তাহার শ্মশানবন্ধুদের কাঁধে চড়িয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া গেলেন। ভবতোষের চোখদুইটা আবার জলে ভরিয়া আসিল। চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবী মনে হইল যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে।

ভবতোষের মা'র মৃতদেহ সংকারের জন্য রতন চৌধুরী কয়েকটি টাকা খরচ করিয়াছিলেন, পরদিন সকালে ভবতোষকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখিলেন। লোকে ভাবিল রতন চৌধুরীর দয়া ধর্ম্ম আছে।

কিন্তু এত বেশি দয়া বোধকরি ছেলেটার পছন্দ হইল না। ভবতোষের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়াই রতন চৌধুরী তাহার সংসারের প্রত্যেকটি বস্তু নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন, ধান চাল গরু বাছুর এমন-কি বিছানা বালিসটি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইল, এবং কিছুদিন পরেই দেখা গেল, ভবতোষের বাড়ীখানি চৌধুরী মহাশয়ের গোয়ালে পরিণত হইয়াছে।

ভবতোষ রতন চৌধুরীর বাড়ীতেই থাকে, সেইখানেই খায়, সেইখানেই শোয়, আর একা-একা মন-মরা হইয়া গ্রামের পথে

পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে না, আপনমনেই কি যে ভাবে সে-ই জানে।

রতন চৌধুরীর স্ত্রী একদিন ভবতোষকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বামুনের ছেলে, পৈতে না দিলে লোকে নিন্দে করবে। পরশু তোর পৈতে দেবো, বুঝলি?'

যতটুকু আয়োজন না করিলে নয়, ভবতোষের যজ্ঞোপবীত ধারণের জন্য রতন চৌধুরী ঠিক ততটুকু আয়োজনই করিলেন।

মাথা ন্যাড়া করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া ভবতোষ ছান্‌লাতলায় গিয়া দাঁড়াইল। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সুমুখে হোমের আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল। মণ্ডপের নীচে গ্রামের ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা উপস্থিত হইয়াছেন। দণ্ডীর বেশে দণ্ডায়মান প্রিয়দর্শন গৌরবর্ণ বালক ব্রহ্মচারী ভবতোষকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

ব্রহ্মচারীকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় তাহার গর্ভধারিণী জননীর কাছে।

জোড় হস্তে অঞ্জলি পাতিয়া ভবতোষ বলিল, 'ভবতি ভিক্ষাম্ দেহি মাতঃ!'

কিন্তু কোথায় তাহার সেই সর্ব্বমঙ্গলা জননী?

আজ কে তাহার মা হইবে?

রতন চৌধুরীর স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিলেন। পুরোহিত বলিলেন, 'এসো মা তুমিই ব্রহ্মচারীকে প্রথম ভিক্ষে দাও। আজ থেকে তুমিই ওর মা হ'লে।'

ভিক্ষা তিনিই দিলেন। তিনিই আজ ভবতোষের মা হইলেন।

কিন্তু ভবতোষের চোখ দুইটি তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

তাহার পর খড়ম পায়ে দিয়া ব্রহ্মচারী এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চায়, মাকেই আবার সস্নেহে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হয়।

পুরোহিতের কথা-মত ভবতোষ অগ্রসর হইল, চতুর্থ পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মা তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন।

অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই হইল না। ব্রহ্মচারীকে তিন দিন অন্ধকার গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। গৈরিক বস্ত্র পরিহিত ব্রহ্মচারী ভবতোষ নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত তিনটি দিন তেমনি করিয়াই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিল। চতুর্থ দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রতন চৌধুরীর স্ত্রীই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিলেন। বলিলেন, 'ছাখ্ বাবা, তোর জন্যে আমি কত কষ্ট করলাম। এসব কথা তোর মনে থাকবে ত' ?'

কিন্তু এত করিয়াও এত বলিয়াও তিনি তাহাকে আট্‌কাইতে পারিলেন না।

সে-বৎসর তখন বৈশাখের শেষ। বৈশাখী বৈকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পশ্চিম দিকচক্রবাল অন্ধকার করিয়া ঝড় উঠিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে। কড়্ কড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতেছে। দৈবাৎ যাহারা ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিল সকলেই তাহারা

ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর ঠিক সেই সময়েই দেখা গেল, রতন চৌধুরীর বাড়ী হইতে ভবতোষ নিরুদ্দেশ !

কেন সে গেল, কোথায় গেল—কেহ কিছুই জানিল না। জানিবার চেষ্টাও কেহ করিল না।

গ্রামের মধ্যে শুধু একটা গুজব রটিল যে, যজ্ঞোপবীতের সময় ছেলেটা তিন পা'র জায়গায় চার পা বাড়াইয়াছিল এবং সেই জন্যই কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

ছোট একটি শহরের একটা বাড়ীর দরজায় একদিন দেখা গেল কয়েকজন বেদে-বেদেনী নানারকমের কয়েকটা সাপ লইয়া বাঁশী বাজাইয়া খেলা দেখাইতেছে। অবলীলাক্রমে এমন-কি মেয়েরা পর্য্যন্ত ঝাঁপি হইতে বড় বড় গোখরো সাপগুলাকে টানিয়া টানিয়া বাহির করিতেছে।

প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ ফণা তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া বাঁশী শুনিতেছে, আর তাহার সুমুখে সাপটার ফণার দিকে একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একজন বেদে তাহার তুম্‌ড়ি বাঁশীটি একটানে বাজাইয়া চলিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটা ঢিল আসিয়া পড়িল সাপের ঝাঁপিটার পাশেই। কেহ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সাপুড়ে একবার সেইদিকে তাকাইয়া আবার তাহার কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু খানিক্ পরেই আবার আর-একটা প্রকাণ্ড ঢিল! এবার ঢিলটা আসিয়া পড়িল সাপটার ঠিক ফণার উপর। ঢিল খাইয়াই সাপটা ফোঁস্ করিয়া তাহার ছোবল্ চালাইল বেদের পায়ে। বেদের বাঁশী বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সাপটাকে সে ঝাঁপি-বন্ধ করিয়া থলি হইতে একটা বিষ-পাথর বাহির করিল। পায়ের ক্ষতস্থান হইতে তখন রক্ত গড়াইতেছে।

বেদে তাহার নিজের চিকিৎসা নিজেই করিতে লাগিল। ওদিকে কয়েকজন বেদে বেদেনী ছুটিল ঢিলটা কে ছুঁড়িয়াছে তাহারই সন্ধানে।

খানিক্ পরে একজন বেদেনী চোদ্দ-পনেরো বছরের হৃষ্টপুষ্ট যে ছেলেটিকে ধরিয়া আনিল, দেখা গেল, সে আমাদের ভবতোষ।

বেদে তখন তাহার জহর পাথর দিয়া বিষটাকে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। ভবতোষকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'ঢিল তুমি ছুঁড়েছিলে?'

ভবতোষ বলিল, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

ভবতোষ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেক করিয়াও তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও কেহ বাহির করিতে পারিল না।

তাহার পর কেমন করিয়া কোন্ দিক দিয়া কি যে হইল কেহ কিছুই জানিল না, শুধু দেখা গেল, ভবতোষ তাহার সে-গ্রামের আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং ব্রাহ্মণের ছেলে বেদে বেদেনীর

দলে ভিড়িয়া গিয়া যাযাবরের মত এ-গ্রামে সে-গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ভবতোষকে দেখিয়া এখন আর সে ভবতোষ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। চমৎকার চেহারা, মাথায় একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরি চুল, চওড়া বুকের ছাতি, যেমন সুপুরুষ তেমনি জোয়ান! গায়ে অসাধারণ শক্তি।

কেমন করিয়া সে যে ওস্তাদ্‌জির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে কে জানে। সাপ ধরিবার সমস্ত কৌশল সে তাহাকে একটি একটি করিয়া শিখাইয়াছে। শিখাইয়াছে কেলে-গোখরোর বিষ-দাঁত কেমন করিয়া ভাঙ্গিতে হয়, কেমন করিয়া কোন্ গাছের শিকড় তাহাদের মুখের কাছে ধরিলে তাহারা আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না, মানুষকে সাপে কামড়াইলে কেমন করিয়া কি ঔষধ দিয়া রোগীকে বাঁচাইতে হয়, তুম্‌ড়ি বাজাইয়া সাপ খেলানোর প্রতি-যোগিতায় অপর পক্ষকে পরাজিত করিতে হইলেই-বা কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত। এম্‌নি-সব নানান্ বিদ্যা ভবতোষ এমন ভাবে শিখিয়া ফেলিয়াছে যে, দলের সকলেই আজকাল তাহাকে কেমন যেন ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঈর্ষার চক্ষে দেখিবার কারণ যে শুধু ওই একটি, তাহা নয়; আরও কারণ অবশ্য আছে। কিন্তু তাহা গোপনীয়। মুখ ফুটিয়া সহজে সে-কথা কাহারও বলিবার উপায় নাই। ওস্তাদজির কানে উঠিলেই সর্ব্বনাশ!

ওস্তাদজি সাপের ওস্তাদ ত' বটেই, তাহা ছাড়া গানেরও

ওস্তাদ। নিজে সে ভাল গান গাহিতে পারে, বেহালা বাজাইতে পারে, বাঁশী বাজাইতে পারে।

ওস্তাদজির থাকিবার মধ্যে আছে তাহার একমাত্র কন্যা নাম্নী। নাম্নী সুন্দরী, নাম্নী যুবতী—দেখিলে বেদের মেয়ে বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

এক-একদিন সন্ধ্যায়, রোজগার যেদিন তাহার কিছু বেশি হয়, ওস্তাদজি সেদিন একটুখানি মদ্য পান করে। তাহার পর তাহার ছোট্ট তাঁবুটির মধ্যে বেহালাটি লইয়া বসে। ভবতোষকে সে শুধু সাপের বিদ্যা শেখায় নাই, ডুগি-তব্‌লা বাজাইতেও শিখাইয়াছে।

ওস্তাদজি ডাকে, 'ভবতোষ!'

কি জন্য তাহার ডাক পড়িয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডুগি-তব্‌লা লইয়া বসিতে হয়। নাম্নী গান গায়, নাচে। ভবতোষ ও ওস্তাদজি সঙ্গত্‌ করে।

এম্‌নি করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের নাচগান চলিতে থাকে। একমাত্র ভবতোষ ছাড়া আর কেহ সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

এমনি একান্তে বাস করিয়া ভবতোষের সঙ্গে নাম্নীর ভালবাসা দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে।

লোকজনের ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক।

কথাটা মিথ্যাও নয়।

সেবৎসর তখন তাহারা সাঁওতাল পরগণায়। রাঙ্গামাটির

দেশে। বসন্তকাল। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়; শাল, মহুয়া আর পলাশের জঙ্গল। কোকিলের ডাকে কান ঝালাপালা হইয়া যায়। মহুয়া আর শালফুলের তীব্র সুগন্ধে আকাশ-বাতাস যেন ভারি হইয়া থাকে।

প্রকাণ্ড একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়া সদলবলে তাহারা এক শহর হইতে আর-এক শহরে যাইতেছিল। তখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই। রৌদ্রের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছে। পশ্চিম আকাশে বহুবিচিত্র বর্ণের সমারোহ। অস্ত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ রক্তিম রশ্মি সুদীর্ঘ তরুশীর্ষে এবং সঘনচিক্কণ পত্রপল্লবে প্রতিফলিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

দুই পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বনানীর মধ্য দিয়া সরু একফালি পায়ে-চলার পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারই উপর দিয়া বেদের দল গল্প করিতে করিতে গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিতেছিল।

হঠাৎ কোন্ সময় একটা প্রজাপতি ধরিতে গিয়া নাম্নী সকলের পিছনে পড়িয়া গেল। আর-সকলের দৃষ্টি এড়াইলেও ভবতোষের তাহা দৃষ্টি এড়াইল না।

পিছনে ফিরিয়া ভবতোষ তাহার কাছে গিয়া বলিল, 'আয়!'

নাম্নী বলিল, 'আমাকে এই প্রজাপতিটা ধরে দেবে?'

ভবতোষ বলিল, 'ছিঃ! প্রজাপতি ধরে না। ওরা সব এগিয়ে গেল, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আয়।'

নান্নী হাসিয়া বলিল, 'যাক্ না এগিয়ে! কেন, তোমার কি ভয় করছে নাকি?'

ভবতোষ বলিল, 'না, ভয় কিসের! আয়!' বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া কয়েক পা আগাইয়া গিয়াই পিছন ফিরিয়া দেখে, নান্নী নাই।

নান্নী! নান্নী! বলিয়া ভবতোষ তাহাকে খুঁজিবার জন্য আবার খানিকটা পিছাইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ খিল্ খিল্ হাসির শব্দ শুনিয়া থমকিয়া থামিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, 'কোথায়? কোথায় তুই?'

বাঁদিকে পথ ভাঙ্গিয়া নান্নী কোন্ সময় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। দূরে একটা মহুয়া গাছের আড়াল হইতে নান্নী বলিল, 'কুহু!'

ভবতোষ ছুটিয়া গিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'আয়—আজ তোর বাবাকে বলে' তোকে মার খাওয়াচ্ছি ছাখ্!'

'তবে ত যাবই না।' বলিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া নান্নী আরও খানিকটা জঙ্গলের ভিতরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভবতোষ বলিল, 'যা তবে, আমি এই চললাম।' বলিয়া সে তাহাকে একা ফেলিয়াই চলিয়া আসিতেছিল, নান্নী ছুটিয়া আসিয়া তাহার পিছন ধরিল। বলিল, 'আমাকে একটা ফুল পেড়ে দেবে?'

'কি করবি?'

'মাথায় পরব।'

'না, ফুল মাথায় পরে না। আয়।'

'না আমি পরব।'

'না পরে না! ওই শোন্ শেয়াল ডাকছে। ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। চল।'

'না আমি যাব না। তুমি আমাকে ফুল পেড়ে দাও বলছি।' এই বলিয়া ঘুরিয়া সে তাহার স্মুখে আসিয়া দু'হাত বাড়াইয়া পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল।

কাছেই একটা গাছে বিস্তর ফুল ফুটিয়াছিল। বাধ্য হইয়া ভবতোষকে সেইখানে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। বারকতক্ হাত বাড়াইয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া দেখিল, ফুলের ডাল অনেক উঁচুতে, গাছে না উঠিলে ফুল পাড়া অসম্ভব।

নাম্নী বলিল, 'তুমি আমার কাঁধে না হয় এই হাতে পা দিয়ে উঠে দাঁড়াও, তাহ্‌লেই নাগাল পাবে। আমি তোমাকে ধরছি।'

নাম্নী তাহার হাত দুইটা নিজের বুকের উপর শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'তুমি দাঁড়াও আমার এই হাতের ওপর পা দিয়ে, পড়বে না, তুমি হ্যাখো!'

ভবতোষ তাহাই করিল।

কিন্তু যেই সে উঠিয়া দাঁড়াইবে, নাম্নী ইচ্ছা করিয়াই হোক্, কিম্বা যে-কোনো কারণেই হোক্, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া এমন ভাবে হাতদুইটা তাহার ছাড়িয়া দিল যে, দু'জনেই জড়াজড়ি করিয়া গড়াইয়া পড়িল মাটিতে।

ভবতোষ তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নান্নী তখন তাহার দুই হাত দিয়া এমনভাবে প্রাণপণ শক্তিতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, ভবতোষ উঠিতে পারিল না। বলিল, 'ছাড়্ নান্নী আমাকে ছেড়ে দে!'

নান্নীর মুখখানা ভবতোষের মুখের উপর! দু'জনের নিশ্বাসের বাতাস দু'জনের মুখে আসিয়া লাগিতেছে। নান্নী বলিল, 'না, ছাড়বো না।'

বলিয়াই সে তাহার মুখখানা ভবতোষের মুখের আরও কাছে লইয়া গিয়া সজোরে তাহাকে এক চুম্বন করিয়া বলিল, 'চল আমরা পালাই।'

নির্জ্জন নিস্তব্ধ গভীর অরণ্য। নান্নী নবোদ্ভিন্নযৌবনা পরমা সুন্দরী যুবতী, ভবতোষ প্রিয়দর্শন যুবক, কাহারও মন্দ লাগিবার কথা নয়। কিন্তু কি জানি কেন, ভবতোষ সজোরে তাহাকে ঝাট্‌কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কঠোর কর্কশ কণ্ঠে কহিল, 'তোর সাহস ত' কম নয় নান্নী!'

ভবতোষ যে এমন করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নান্নী তাহা ভুলিয়াও কোনোদিন ভাবিতে পারে নাই। লজ্জায় তখন সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। না পারিল মুখ তুলিয়া চাহিতে, না পারিল একটা কথা বলিতে। শুধু তাহার দুই চোখের কোণে দুটি অশ্রুর ধারা টল্ টল্ করিতে লাগিল।

নিষ্ঠুর নির্ব্বিকার ভবতোষ তাহা দেখিয়াও দেখিল না, নান্নীর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন

করিয়া লইয়া উপযাচিকা যুবতীর যৌবন এবং রমনীর প্রেম স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করিয়া সে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

কোথায় গেল কে জানে! বেদের দলে নান্নী অবশ্য ফিরিয়া গিয়াছিল কিন্তু ভবতোষকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

কিছুদিন পরে, পশ্চিমের একটি শহরে উন্মুক্ত একটা মাঠের উপর প্রকাণ্ড একটা তাঁবু খাটাইয়া কোথাকার কোন্ এক সার্কাস পার্টি বাঘ-সিংহের খেলা দেখাইতেছিল, হঠাৎ একটা বাঘ ক্ষেপিয়া গিয়া যে-লোকটা খেলা দেখাইতেছিল তাহাকেই আক্রমণ করিল।

দর্শকের দল প্রাণের ভয়ে ছুটিয়া পালাইতে ছিল, এমন সময় দর্শকের ভিড় হইতে একজন লোক ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং বেড়া ডিঙ্গাইয়া ভিতরে গিয়া অমিত বিক্রমে বাঘটাকে সে এমন ভাবে দু'হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল যে সে আর টুঁ শব্দটি করিতে পারিল না। বাঘটা বারকতক্ থাবা চালাইল, লোকটাকে জখম্ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা যে সে না করিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার আগেই সার্কাসের লোকজন আসিয়া পড়িল, বাঘটাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া খাঁচায় পুরিল।

কিন্তু যে-ছোক্‌রাটি আজ এই প্রাণান্তকারী বিপদ হইতে সার্কাসের লোকটিকে বাঁচাইয়া দিল, তাহাকে আর-কেহ না চিনিলেও আমরা চিনিলাম।

সে আমাদের ভবতোষ।

ভবতোষ চলিয়া যাইতেছিল, ছুটিতে ছুটিতে সার্কাসের একটি ছেলে আসিয়া তাহাকে আট্‌কাইল। বলিল, 'আপনি আসুন!'

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায়?'

ছেলেটি বলিল, 'আমাদের কত্তা একবার আপনাকে ডাকছেন।'

ভবতোষ কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিল।

সার্কাসের মালিক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মাথার চুল, গোঁফ, সবই সাদা হইয়া গিয়াছে। দেখিলেই মনে হয়—যৌবনে তাঁহার শক্তি ছিল অসাধারণ। নাম—রামপদ আচার্য্য। গলায় সাদা ধপধপে যজ্ঞোপবীত।

ভবতোষ তাঁহার সুমুখে গিয়া দাঁড়াইতেই রামবাবু তাহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'তুমি? হ্যাঁ—ঠিক, এই আমি চাই। বাঙ্গালীর ছেলে—বাঃ, এসো বাবা, বোসো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি।'

ভবতোষ বসিল। রামবাবু বলিলেন, 'তোমার নামটি কি বাবা?'

ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'ব্রাহ্মণ! ভাল, ভাল। কি কর?'

'কিছুই করি না।'

'কোথায় বাড়ী?

'বাড়ী এককালে ছিল বীরভূম জেলার ছোট একটি গ্রামে,

এখন আর সেটা আছে কিনা জানি না। বাড়ী-ঘর মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন কেউ আমার নেই।'

রামবাবু খানিক্ক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'থাকবে আমার এই সার্কাস-পার্টিতে? কাজকর্ম্ম শিখবে, খাবে দাবে, কিছু মাইনে পাবে।'

ঈষৎ হাসিয়া ভবতোষ বলিল, 'তাহ'লে ত' বেঁচে যাই। কাল থেকে কিছু খেতে পাইনি, দিন্ না কিছু খেতে!'

রামবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে খাবার আনাইয়া দিলেন।

ভবতোষ যাহা চাহিতেছিল তাহাই পাইল।

সার্কাসের দলের সঙ্গে ভবতোষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে দলটি আসিল বর্দ্ধমান শহরে। শহরের একপ্রান্তে তাঁবু পড়িয়াছে। প্রত্যহ খুব জোর খেলা দেখানো হইতেছে। সাতদিন সেখানে থাকিবার কথা। কিন্তু প্রচুর টাকা আসিতেছে দেখিয়া রামবাবু বলিলেন, 'আরও কিছুদিন থাকা যাক্ এখানে।'

সার্কাসের তাঁবু যেখানে পড়িয়াছে, তাহারই কাছাকাছি একটা বাড়ীতে হঠাৎ একদিন কান্নার রোল উঠিল। শোনা গেল, প্রসন্নময়ী নামে এক ব্রাহ্মণের বিধবার একমাত্র মেয়ে ভবানীকে সাপে কামড়াইয়াছে। মেয়েটা বোধহয় মরিয়া গেল তাই এত কান্না!

খবরটা শুনিয়া ভবতোষ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,

তৎক্ষণাৎ ছুটিল প্রসন্নময়ীর বাড়ীর দিকে। উঠানে বিস্তর লোকজন জড়ো হইয়া গেছে। বহুকালের পুরাতন ইট-বাহির-করা একখানা দোতলা বাড়ী, চারিদিকে কলাগাছের জঙ্গল। সাপ ত' দূরের কথা, বাঘ লুকাইয়া থাকিলেও টের পাইবার উপায় নাই।

মেয়েটিকে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে বাড়ীর রকে। ভবতোষ গিয়া দেখিল, মেয়েটি তখনও মরে নাই, তবে চিকিৎসার নামে মেয়েটির দেহের উপর যেরকম নিষ্ঠুর ভাবে নিপীড়ন চলিয়াছে তাহাতে মরিবার বিশেষ বিলম্ব আছে বলিয়াও মনে হয় না।

মেয়েটির নাম ভবানী। সুন্দরী যুবতী। প্রসন্নময়ীর একমাত্র কন্যা। এখনও বিবাহ হয় নাই।

ভবতোষের সঙ্গে গিয়াছিল তাহার সার্কাসের দলের অন্তরঙ্গ বন্ধু—অমরেশ। ভবতোষ বলিল, 'আমি ওকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি ছাখ্।'

অমরেশ বলিল, 'কিন্তু থাম্, মাগীর টাকা আছে, কি দেবে আগে জিজ্ঞাসা করি।'

ভবতোষ বলিল, 'তাই কর্, আমি ততক্ষণ ওই ঝোপ থেকে একটা গাছ তুলে আনি।'

এই বলিয়া লোকজনের ভিড় কতক্ সরাইয়া দিয়া ভবতোষ 'জড়ি' আনিতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, প্রসন্নময়ী বলিয়াছেন, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু তিনি দিতে পারিবেন না, তবে তাহার ভবানীকে

ওই ছোক্‌রাটি যদি বাঁচাইয়া দিতে পারে ত' উহারই সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবেন।

এই অদ্ভুত প্রস্তাব তিনি করিতেন কিনা সন্দেহ। মনে হইল, অমরেশই তাঁহাকে সে প্রস্তাবে রাজি করিয়াছে। কারণ মেয়েটা ত' মরিয়াই গিয়াছে, এ-ক্ষেত্রে তাহাকে পরের হাতে বিলাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে যদি বাঁচে ত' বাঁচুক্।

রোগিনীকে লইয়া ভবতোষ অনেক কাণ্ড করিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক্ ধরিয়া নানাপ্রকার চিকিৎসার পর ভবানী চোখ মেলিয়া তাকাইল।

আনন্দের আতিশয্যে প্রসন্নময়ী আরও জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিলেন। অমরেশ তাঁহাকে অনেক কষ্টে থামাইল।

ভবানীকে বাঁচাইয়া দিয়া ভবতোষ অমরেশকে বলিল, 'চল্ যাই।'

কিন্তু প্রসন্নময়ী এত সহজে তাহাদের যাইতে দিলেন না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে পাঁচটি টাকা আনিয়া ভবতোষের হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'অনেক কষ্ট করলে বাবা, এই টাকা পাঁচটি নিয়ে যাও।'

অর্থাৎ ভবানীকে বাঁচাইবার আগে যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন সেটা মাত্র কথার কথা। তাহার বদলে এই পাঁচটি টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ দিয়া তাহাদের তিনি বিদায় করিতে চাহিলেন।

অমরেশ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। বলিল,'ঠাকরুণ ত' বড় চমৎকার মেয়ে দেখছি! উঁহুঁ, টাকা আপনি তুলে রাখুন, ও-সব চলবে না, বিয়ে আপনাকে দিতে হবে।'

প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'সে কেমন করে' হয় বাবা? আমরা হ'লাম গিয়ে কুলীন বামুন, আমার এই একটিমাত্র মেয়ে—'

অমরেশ বলিল, 'ভবতোষ যে কুলীন বামুন নয় তাই-বা আপনাকে কে বললে? আমি কি সে-সব না জেনেশুনেই বলেছি ঠাকরুণ! ভবতোষ বাঁড়ুজ্যে, আপনারা মুখুজ্যে, বিয়ে আপনাকে দিতে হবে, আমি বরং আমাদের কর্ত্তাকে ডেকে আনছি।'

কথাটা শুনিয়া রাম আচার্য্য বড় খুশী হইলেন।

ভবতোষ আপত্তি করিতেছিল, কিন্তু তাহার সে আপত্তি অমরেশ শুনিল না, রামবাবুও শুনিলেন না। প্রসন্নময়ীর কাছে রামবাবু নিজে গিয়া দাঁড়াইতেই সব দিক দিয়া সব ব্যবস্থাই হইয়া গেল। তিন দিন পরে ভাল একটি দিন দেখিয়া ভবানীকে আমাদের ভবতোষ বিবাহ করিল।

এই ত' গেল ভবতোষের ভবঘুরে' জীবনের গোড়ার কথা।

*

* *

এইবার আমাদের আসল গল্পের আরম্ভ।

সার্কাসের পার্টি বৎসরের মধ্যে ছ'মাস মাত্র বাহিরে থাকে,

শহরে শহরে খেলা দেখাইয়া টাকা রোজগার করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আর বাকি ছ' মাস সকলেরই ছুটি।

সকাল-সকাল বর্ষা যে-বৎসর নামে, সে-বৎসর বৈশাখের মাঝামাঝি তাঁবু গুটাইয়া জন্তু-জানোয়ার লইয়া কোম্পানী কলিকাতায় ফিরিয়া আসে, লোকজন সব ছুটি পাইয়া বাড়ী চলিয়া যায়। আবার ঠিক পূজার পরেই কাজ আরম্ভ হয়।

ভবতোষের গ্রামের বাড়ীখানা এখনও টিকিয়া আছে কিনা কে জানে। যদি থাকে, রতন চৌধুরীর খপ্পর হইতে এবার সেটাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

সার্কাসের ছুটি কয়মাস ভবতোষ কলিকাতায় গিয়া রাম আচার্য্যের বাড়ীতেই কাটায়। কিন্তু সে-বৎসর আর তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইল না, বর্দ্ধমানে তাহার শাশুড়ীর বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

ভবানীকে বিবাহ করিয়া ভবতোষ ভাবিয়াছিল—তাহাকে হয়ত আঁর এই সার্কাস-পার্টিতে চাকরি করিতে হইবে না। বড়লোক শাশুড়ীর একমাত্র জামাই হইয়া পরমানন্দেই হয়ত তাহার দিন কাটিবে।

কিন্তু বিবাহের পর মাস-দুই-তিন পার হইতে না হইতেই শাশুড়ী প্রসন্নময়ীকে একদিন সে চিনিতে পারিল। বিবাহ হইয়াছে বৈশাখে, তখন আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস, পুরাদমে বর্ষা নামিয়াছে, তাহার উপর নবপরিণীতা বধূ ভবানী পূর্ণযৌবনা তন্বী তরুণী পরমাসুন্দরী। সার্কাসের কাজে লাগিবার এখনও

অনেক দেরি। ভবতোষ ভাবিয়াছিল, বর্ষাটা এইখানেই কাটাইয়া আগামী পূজার পর সার্কাসের কাজে গিয়া লাগিলেই চলিবে। এই ভাবিয়া সে নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইতেছে, এমন দিনে শাশুড়ী প্রসন্নময়ী তাহাকে হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, 'তোমার কি কাজকর্ম্ম নেই বাবা ?'

প্রশ্ন শুনিয়া ভবতোষের রাগ হইবার কথাই।

কিন্তু বাহিরে তাহার সে রাগ প্রকাশ না করিয়া ভবতোষ বলিল, 'কাজ কেন থাকবে না ? আমার কাজ ত সেই পূজোর পর।'

প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'সে-কথা সহজে কেউ বিশ্বাস করে না ভবতোষ। ছ'মাস কাজ আর ছ'মাস ছুটি—জজ্-সায়েবদেরও হয় না।'

ভবতোষ চুপ করিয়া রহিল বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা তাহার কেমন যেন করিতে লাগিল।

প্রসন্নময়ী আবার বলিলেন, 'তোমার কথা বলতে লোকের কাছে আমার বড় লজ্জা করে বাবা। সেদিন রক্ষিতদের বৌ বললে, কি গো ঠান্দি, জামাইটি কি তোমার ঘর-জামাই রইলো নাকি ? লজ্জায় মরে গেলুম। তা বাছা চাকৃরি-বাকৃরি না থাকে, মাসখানেকের জন্যে কোথাও ঘুরে এসো !'

আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী বোধকরি কথাগুলা শুনিয়াছিল।

ভবতোষ কাপড়-জামা পরিতেছে দেখিয়া লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া ভবানী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীতে লোকজন বড় একটা কেহ না থাকিলেও ঝি-চাকরের সুমুখে দিনের বেলা ভবানী তখনও তাহার স্বামীর কাছে কোনদিনই আসে না। সেদিন কিন্তু না আসিয়া পারিল না। চুপি-চুপি বলিল, 'কোথা যাও?'

ভবতোষ বলিল, 'সবই ত শুনলে!'

ভবানীর মুখখানি শুকাইয়া গেল। কি যেন বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না।

ভবতোষ তাহার মুখের পানে তাকাইল। ভবানীর কোনও দোষ নাই। বোধ করি তাহাকে খুশী করিবার জন্যই ভবতোষ তাহার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'আবার আসব।'

ভবানী বলিল, 'পূজোর পর ত' কাজে লাগবে গিয়ে। তখন আসবে কেমন করে?'

ভবতোষ বলিল, 'পূজোর আগেই এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব।'

ভবানী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

ভবতোষ বলিল, 'যাবে ত?'

'কেন যাব না?'

'সেই ভালো। চিঠি দেবো, জবাব দিও।'—এই বলিয়া

ভবতোষ একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া, যাইবার পূর্ব্বে ভবানীকে বোধকরি একবার কাছে টানিয়া আনিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার জন্যই হাত বাড়াইল, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা কিনা জানি না, লজ্জায় ভবানী খানিকটা সরিয়া দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, 'সরো।'

ভবতোষ এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই, ভবানীর এই লজ্জার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া চোখ ফিরাইতেই দেখিল, সুমুখে বারান্দার এককোণে শাশুড়ী-ঠাকরুণ দাঁড়াইয়া আছেন।

ভবতোষ ভাবিয়াছিল, বাড়ী গিয়াই শাশুড়ীকে এই মর্ম্মে একখানা চিঠি লিখিবে যে, ভবানীকে আর ওখানে সে রাখিবে না। ভাল একটি দিন স্থির করিয়া তাহার এক জ্ঞাতিভ্রাতাকে পাঠাইবে। লিখিবে, তাহারই সঙ্গে যেন ভবানীকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন।

ভবতোষ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, বাড়ীটা তাহার তখনও ঠিক তেমনি আছে। ভাবিয়াছিল, রতন চৌধুরীর কাছ হইতে সেটা আদায় করিতে তাহাকে বেগ পাইতে হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, রতন চৌধুরী একটি কথাও বলিলেন না, বরং খুশী হইয়াই বাড়ীটা তিনি ছাড়িয়া দিলেন।

বর্ষার আগে সে-বৎসরের বৈশাখী ঝড়ে খড়ো ঘরখানা তাহার একেবারে বেআব্রু করিয়া দিয়াছে। কিছু খড় কিনিয়া

ঘরের চালটা না-হয় সারাইলেই সে ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যাইবে, কিন্তু আর-একটা বাধা সে অতিক্রম করে কেমন করিয়া! সে বাধাটা হইতেছে এই যে, গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ী সেবৎসর ম্যালেরিয়ায় একেবারে হাঁসপাতাল হইয়া আছে, কত লোক যে মরিয়াছে, কত লোক যে এখনও ভুগিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এ অবস্থায় ভবানীকে এখানে আনা চলে না। ভবতোষ ভবানীকে একখানি চিঠি লিখিল।

ভবানী জবাব দিল, ভালই হইয়াছে। পূজার পর তুমি চাকরিতে চলিয়া গেলে একা-একা ছ'মাস আমি ওখানে কাটাইতাম কেমন করিয়া! মায়ের উপর রাগ করিও না। মা অমনি। তাহা ছাড়া মায়ের বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি বাড়ীঘর—

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া বাকিটুকু লিখিতে বোধকরি তাহার লজ্জা হইয়াছে। লিখিয়াছে, সবই ত তুমি জানো। কাজে যাইবার আগে আমার সঙ্গে একটিবার দেখা করিয়া যাইবে।

শেষ পর্য্যন্ত ভবতোষের রাগ করা আর চলিল না। আবার সেই শাশুড়ীর বাড়ী যাইতেও হইল, সেখানে গিয়া থাকিতেও হইল কিন্তু শাশুড়ি-জামাই-এর মধ্যে কি কুক্ষণে যে একটা গোল[illegible] বাধিয়া রহিল তাহা আর সারাজীবনেও মিটিল না।

জামাইএর ধারণা শাশুড়ীটা পাজী, শাশুড়ীর ধারণা জামাইটা ছোটলোকের একশেষ!

ভবতোষ তাহার দুঃখের কথা কাহাকে আর বলিবে! ভবানী

ছাড়া অন্তরঙ্গ বলিতে তাহার কেই-বা আছে ! শাশুড়ী কিন্তু পাড়া পড়শী সকলের কাছেই বলিয়া বেড়ান : 'মেয়েটার এখানে বিয়ে দিয়ে বড় ভুল করেছি মা।'

ভবানী সবই শোনে, অথচ মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পরে না। একদিকে মা, আর একদিকে স্বামী ! কাজেই কাছে যখন তাহার মাও থাকে না, স্বামীও থাকে না, তখন সে একাকিনী বসিয়া বসিয়া কাঁদে।

ভবতোষকে প্রায়ই বলিতে শোনা যায়, 'বেশ ত আমি গরীব, গরীব বলেই সার্কাস-পার্টিতে কাজ করি, তার জন্যে শাশুড়ী যদি কারও কাছে মুখ দেখাতে না পারেন ত' আমার একটা ব্যবস্থা করে' দিলেই পারেন ! শাশুড়ীর ত' টাকার অভাব নেই !'

প্রসন্নময়ীর কানেও যে কথাটা না উঠিয়াছে এমন নয়। কিন্তু প্রসন্নময়ী জামাইএর উপর প্রসন্ন মোটেই নন। বলেন, 'তা বই কি ! ওই গাড়োল্ জামাইটার পেছনে আমি টাকা ঢালি আর উনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খান ! তা আর হচ্ছে না বাবা, সে গুড়ে বালি ! মেয়ের আমার একটা ছেলেপুলে হোক, তারপর দিতে যদি হয় ত' সেই তাকেই দেবো। মেয়েকেও দেবো না—জামাইকেও দেবো না।'

ভবানীর বিবাহের তখনও দু'বৎসর পার হয় নাই। ভবতোষ ছিল সার্কাসের দলে। দু' তিন জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পোষ্টাপিসের

কালো কালো ছাপে ভর্ত্তি হইয়া একদিন একখানি চিঠি ভবতোষের হাতে আসিয়া পৌছিল। চিঠিখানি ভবানী নিজের হাতে লেখে নাই, তাহারই পাড়াপড়শী কোনও বান্ধবীকে দিয়া লিখাইয়াছে। লিখাইয়াছে—'তোমার একটি খোকা হইয়াছে। দেখিতে ঠিক তোমারই মত। যদি ছুটি পাও ত' একবার আসিয়া দেখিয়া যাও।'

চিঠিখানা হাতে লইয়া অমরেশ আসিয়াছিল হাসিতে হাসিতে। বলিল, 'আজ আমাকে কিছু খাইয়ে দাও ভবতোষ, সুসংবাদটা আমার কাছ থেকেই প্রথম পেলে।'

অমরেশ বলিল, 'যাও একবার দেখে এসো।'

ভবতোষ হেঁটমুখে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাবছো কি?'

'ভাবছি দু'জনের কাজ……বাঘ সিংহের খেলা দেখিয়ে আবার ট্রাপিজের খেলা,—দুটো একসঙ্গে—'

অমরেশ কথাটা তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'সে ক্ষমতা আমার আছে।'

সে-কথা সত্য। অমরেশের স্বাস্থ্য সুগঠিত, ব্যায়ামপুষ্ট চমৎকার দেহখানি, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—সে শক্তিমান পুরুষ।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভবতোষ তাহার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা দমন করিল। বলিল, 'না, থাক্।'

অমরেশ বলিল, 'কেন, থাকবে কেন?'

'আছে কারণ, বলবো এর পর।' বলিয়া ভবতোষ চুপ করিয়া রহিল।

কারণ এমন বিশেষ কিছুই নয়। অমরেশকে কিছুই সে বলিল না বটে, কিন্তু ভবানীকে সেইদিনই সে একখানি চিঠি লিখিল। অনেক কথার পর লিখিল,—'খোকাকে দেখিবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, দু'-এক দিনের ছুটি লইয়া দেখিয়া আসিতে পারিতাম, কিন্তু অনেক কষ্টে সে-ইচ্ছা দমন করিয়া রাখিলাম। তোমার মা আমাকে যে-রকম বিষ-নজরে দেখেন, আমি চাইনা যে, আমার খোকাও তাঁহার কাছ হইতে সেই রকম ব্যবহার পায়। আমার সন্তান ভাবিয়া খোকাকে তিনি যেন অবহেলা না করিয়া তোমার সন্তান ভাবিয়া ভালবাসেন।'

চিঠি লিখিয়া সে চুপ করিয়াই ছিল, কিন্তু মাস-তিনেক পরে হঠাৎ একদিন একখানি চিঠি আসিল,—ভবানী অসুস্থ, এত অসুস্থ যে বাঁচিবার আশা নাই।

এবার আর তাহার বসিয়া থাকা চলিল না। অমরেশকে চিঠি-খানি দেখাইয়া তাহারই হাতে নিজের কাজের ভার দিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে ভবতোষ শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিল।

গিয়া দেখে, সে এক ভারি মজার ব্যাপার!

হাসিতে হাসিতে চমৎকার ফুটফুটে একটি ছেলে কোলে লইয়া

ভবানী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'কেমন, আসতে হ'লো কি-না!'

ভবতোষ অবাক! খানিকক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'তাহ'লে কিছুই তোমার হয়নি?'

ভবানী বলিল, 'হ'লে সুখী হ'তে, না?'

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, 'এরকম ভাবে চিঠি লিখবার মানে? সারারাস্তা আমি কিরকম ভাবতে ভাবতে এসেছি জানো?'

ভবানী আবার হাসিতে লাগিল। বলিল, 'ভালই ত! আমার সৌভাগ্য যে, বাঘ-সিংহী জন্তু-জানোয়ারের কথা না ভেবে আজ শুধু আমার কথাই ভেবেছ!'

'যাক্, ভালই হ'য়েছে, দাও।' বলিয়া ছেলেকে তাহার কোল হইতে নিজের কোলে লইয়া ভবতোষ তাহার মুখের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, ভালবাসিল, আদর করিল, চুমা খাইল।

ভবানী বলিল, 'আমি আর তোমাকে না দেখিয়ে থাকতে পারলুম না, বুঝলে? সেই জন্যেই এমন অসুখের খবর দিয়ে তোমায় চিঠি লিখেছিলুম। অপরাধ হয়ে থাকে—'

হাসিতে হাসিতে ভবানী বলিল, 'গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করবো?'

ভবানী সত্যই তাহাকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, ভবতোষ হাসিয়া তাহাকে নিষেধ করিল।

স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে কয়েকটা দিন পরমানন্দে কাটাইয়া ভবতোষ ফিরিয়া আসিল তাহার কাজের জায়গায়।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন দেখলে?'

ভবতোষ বলিল, 'চমৎকার! কিচ্ছু হয়নি, সব মিছে কথা।'

অমরেশ বলিল, 'ভাল, কিন্তু এবার যদি আমি ছুটি নিই, আমার কাজ তুমি চালাতে পারবে তো?'

ভবতোষ হাসিতে লাগিল। বলিল, 'ছুটি তুমি ত' কখনও নাও না অমরেশ। তোমার না-আছে স্ত্রী, না-আছে কিছু, তোমার আবার ছুটি কিসের?'

অমরেশ বলিল, 'আমি এবার বিয়ে করব।'

ভবতোষ বলিল, 'বেশ। তা হ'লে বাঘ-সিংহের খেলাটা আমায় শিখিয়ে দাও।'

সেইদিন হইতে ভবতোষ অমরেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। শিখিতে লাগিল—কেমন করিয়া পিঞ্জরমুক্ত হিংস্র পশুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, কেমন করিয়া তাহাদের বশে আনিয়া অনুগত ভৃত্যের মত কাজ করাইতে হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছুটির প্রয়োজন অমরেশের কোনদিনই হইল না। জন্তু-জানোয়ারগুলাকে দেখাইয়া এক দিন সে বলিল, 'এরাই আমার স্ত্রী-পুত্র, এরাই আমার যা-কিছু-সব।'

এদিকে এমনি করিয়াই দিন চলিতে থাকে।

ওদিকে ছেলের নাম রাখা হইয়াছে পশুপতি।

শাশুড়ী শুনিয়া ত রাগিয়া আগুন! মেয়ের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'পশুপতি কি লা, পশুপতি কী? যেমন আমার জামাই হয়েছে মুখ্‌খু, তেমনি নাম হবে ত? বনের পশুর সঙ্গে বাস করে কিনা, তাই ছেলের নাম রাখলে—পশুপতি!'

ভবানী বলিল, 'কেন মা, পশুপতি মানে ত' মহাদেব!'

'তা হোক্ বাছা। ওর নাম রাখলাম—কার্ত্তিক। কার্ত্তিকের মতন চেহারা, কার্ত্তিক নামই ভালো।'

কিন্তু শাশুড়ী নাম রাখিলেন বলিয়াই কিনা জানি না, কার্ত্তিক নামটা ভবতোষের তেমন পছন্দ হইল না। সে তাহাকে পশুপতি বলিয়াই ডাকিতে লাগিল।

ভবতোষ পশুপতিকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে প্রসন্নময়ীর তাহা সহ্য হয় না। আপন মনেই বলেন, 'আ-মর্! বাপ সাজছেন! ওলো, ও সুমতি!'

ঝির নাম সুমতি।

সুমতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে প্রসন্নময়ী বলেন, 'নিয়ে [illegible] ত বাছা ছেলেটাকে!'

ভবতোষের কোল হইতে সুমতি ছেলে লইয়া চলিয়া যায়।

রাত্রে এক-একদিন ছেলেটাকে প্রসন্নময়ী নিজের কাছে রাখিয়া দেন। বলেন, 'ছেলে আমার কাছে থাক্। বাপের কাছে থাক্‌লে মাটি হ'য়ে যাবে।'

বৈকালে ছেলে লইয়া ভবতোষ বেড়াইতে যাইতে চাহিলে

প্রসন্নময়ী বলেন, 'থাক্, ছেলে নিয়ে আর বেড়াতে যেতে হয় না।'

এমনি ছোট-খাটো অনেক ব্যাপারে প্রসন্নময়ী ভবতোষকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, ছেলের উপর অধিকার তাঁহারই বেশি।

ভবতোষ সে-কথা আবার ভবানীকে বলে। বলে, 'তোমার মা কেন এরকম করেন বল ত?'

ভবানী বলে, 'কি করেন?'

ভবতোষ বলে, 'এমন ব্যবহার করেন, ছেলে যেন আমার নয়। আমার চেয়ে ছেলের ওপর জোর যেন ওঁরই বেশি।'

ভবানী সবই জানে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া খানিক্ চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, 'মাকে ত জানো। মা অমনি।'

তাহার পর বোধকরি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিতে থাকে, 'ও কাউকে শেখাতে হয় না, বুঝলে? ছেলে তার মা বাপকে ঠিক চিনতে পারে। মা-বাপকে পর কেউ করতে পারে না। তুমি ভেবো না।'

মুখে এই কথা বলে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। মা যে তাহার স্বামীকে কি নজরে দেখিয়াছে কে জানে! অথচ স্বামী তাহার কোনও অপরাধ করে নাই।

ভবতোষের ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সেদিন সে ভবানীকে বলিল, 'কাল আমি যাব ভবানী।'

ভবানী বলিল, 'কালই যাবে?'

'হ্যাঁ, কালই যাব।'

ভবানীর মুখখানি হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল। বলিল, 'আচ্ছা, মাঝে-মাঝে এক আধ দিনের ছুটি নিয়ে আসতে পারো না ?'

ভবতোষ বলিল, 'কোম্পানী যদি এবার অনেক দূরে না চ'লে যায় ত' আসবো।'

ভবানী খানিক চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'আগে ত' আসতে পারতে না, এখন কেমন করে' আসবে ?'

ভবতোষ বলিল, 'সেই যে অমরেশ বলে যে-ছোক্‌রাটির কথা তোমায় বলেছিলাম, তাকে আমি ট্রাপিজের খেলা শিখিয়েছি, আর আমি নিজে তার কাছে শিখেছি বাঘ-সিংহের খেলা। আমি ছুটি নিলে সে আমার কাজ চালিয়ে দেবে, আর সে ছুটি নিলে আমি তার কাজ চালিয়ে দেবো—এই ঠিক হয়েছে।'

ভবানী বলিল, 'বাঘ-সিংহী ? না বাপু, ওসব জন্তু-জানোয়ার নিয়ে খেলা তুমি দেখিও না, আমার ভারি ভয় করে।'

কথাটাকে ভবতোষ হাসিয়াই উড়াইয়া দিল ; হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তুমি এত ভীতু কেন বল ত ?'

ঘরের মেঝেয় পশুপতি একটা টিনের খেলনা লইয়া [illegible] করিতেছিল, ভবতোষ তাহাকে দেখাইয়া বলিল, 'তোমার ছেলে দেখবে—আমার চেয়েও সাহসী হবে।'

এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে পশুপতিকে কোলে তুলিয়া লইল।

ভবানী বলিল, 'না গো না, ওর আর সাহসী হ'য়ে বাঘ-সিংহীর

খেলা দেখিয়ে কাজ নেই। ওর অভাব কি যে, ও তোমার মত ওই-সব করতে যাবে ?'

ভবতোষ বলিল, 'তাও ত বটে! তোমার মা'র বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি সবই ত' ও-ই পাবে। পশুপতি আমাদের বড়লোক, না কি বল? কিন্তু তার এখনও দেরি আছে, তোমার মা আগে মরুক্—'

কথাটা বোধকরি তখনও তাহার শেষ হয় নাই, বাহিরে জানলার কাছে কিসের যেন একটা শব্দ হইল। ভবানী তৎক্ষণাৎ আলোটা হাতে লইয়া বাহিরে গিয়া দেখিল, মা তাহার জানলার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছেন। বুকের ভিতরটা তাহার ছ্যাৎ করিয়া উঠিল।

ফিরিয়া আসিয়া কথাটা সে তাহার স্বামীর কাছে গোপন করিয়া বলিল, 'ও কিছু না।'

ভবতোষ আবার তাহার সেই আগেকার কথার জের টানিয়া বলিয়া যাইতেছিল, 'কিন্তু মা যে তোমার কবে—'

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া ভবানী তাহার কাছে গিয়া মুখ-চোখের ইসারা করিয়া বলিল, 'চুপ কর।'

কিন্তু ইহারই সূত্র ধরিয়া তাহার পরদিন মা ও মেয়েতে ঝগড়া-ঝাঁটির আর বাকি কিছু রহিল না।

ভবতোষ চলিয়া যাইবার পরেই প্রসন্নময়ী তাহার মেয়েকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, 'গেল সে হতভাগা?'

ঝি সুমতি কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। কাহার কথা বলা হইতেছে সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিল, 'কে মা?'

প্রসন্নময়ী বলিলেন, কে আবার! ঐ গুণ্ডাটা! আমার ওই জামাইটা, আবার কে!'

সুমতি মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল।

খানিক দূরে দেখা গেল একটা দরজার গোড়ায় ভবানী তাহার ছেলেকে কোলে লইয়া বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রসন্নময়ী তাহা দেখিলেন। বলিলেন, 'এখানে অমন করে দাঁড়িয়ে কেন লা? আমি কবে মরবো তাই ভাবছিস, না? সেই কথায় আছে না,—জন· জামাই ভাগনা—তিন নয় আপ্‌না। জামাই কখনও আপনার হয়?'

ভবানীর কিছুই বলিবার নাই! তাঁহার মরিবার কথাটা ভবতোষ সেদিন সত্যই বলিয়াছে এবং প্রসন্নময়ী সেকথা শুনিয়াছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু মেয়ে হইয়া মা'র মৃত্যু কামনা সে নিজে ত' করে নাই! তাহা হইলে তাহার দোষ দেওয়া কেন?

ভবানী একটি কথাও বলিল না। প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'আমার নিজের বলতে যা-কিছু সব কালই আমি কার্ত্তিকের নামে লেখাপড়' করে' দেবো। তাতে সর্ত্ত থাকবে এই যে, তোমরা তা থেকে ড় জোর দু'বেলা দুমুঠো খেতে পাবে।'

ভবানী তথাপি নিরুত্তর।

এমনি করিয়াই দিন চলিতেছিল। কিন্তু আবার একদিন

ভবানীর কাছ হইতে ভবতোষ একখানি চিঠি পাইল—'ভবানীর অত্যন্ত অসুখ। দেখিতে চাও ত' আসিও।'

এবারেও চিঠিখানি সে নিজের হাতে লিখে নাই।

চিঠি পাইয়া ভবতোষ একটুখানি হাসিল মাত্র।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'গেলে না যে?'

ভবতোষ হাসিয়া বলিল, 'ও রকম লেখা ওর অভ্যেস! অনেক-দিন যাইনি কি না, তাই এই চালাকি করেছে—সেই সেবারের মত।'

কিন্তু দিন-পনেরো পরে আর-একখানি চিঠি আসিয়া হাজির! চিঠিখানি লিখিয়াছেন প্রসন্নময়ী। শাশুড়ীর কাছ হইতে অকস্মাৎ এই পত্রখানি যে-দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিল তাহা যেমন নিদারুণ তেমনি মর্ম্মান্তিক।

প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন,—দিন দশবারো জ্বরে ভুগিয়া গতকল্য রাত্রি এগারোটার সময় ভবানী মারা গিয়াছে।

ভবতোষের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চোখ দুটো জলে ভরিয়া আসিল। অমরেশ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কি বলিয়া সে যে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে বুঝিতে পারিল না।

অকস্মাৎ এমন করিয়া সে যে মরিয়া যাইবে ভবতোষ তাহা ভাবিতে পারে নাই। যে ভবানীকে সে সুস্থ সবল দেখিয়া আসি-য়াছে, যে ভবানী আসিবার দিনে হাসিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছে, সেই ভবানীকে কোথাও আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না—ইহা ভাবিতেও ভবতোষের সর্ব্বাঙ্গ কেমন যেন হিম হইয়া আসিতে-

ছিল, আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীটা মনে হইতেছিল অন্ধকার হইয়া গেছে।

অমরেশকে কাছে ডাকিয়া ভবতোষ বলিল, 'ছেলেটাকে সেখানে রাখা আর উচিত নয় মনে হচ্ছে।'

অমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় রাখবি ?

ভবতোষ বলিল, 'নিজের কাছে।'

অমরেশ কিছুতেই তাহা সমর্থন করিতে পারিল না, বলিল, 'ছি ! এখানে এই জন্তু-জানোয়ারের মাঝে ছেলেকে রাখে কখনও ! ছেলে তোর বেশ আছে সেখানে, থাক।'

ভবতোষ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবছিস ?'

ভবতোষ বলিল, 'আমার শাশুড়ীটা মানুষ তেমন সুবিধের নয়। আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।'

অমরেশ বলিল 'তাহ'লেও ছেলেকে তুই আনিসনে সেখান থেকে, বুঝলি ? মাগীর ছেলেপুলে নাই, বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি যা কিছু আছে সবই তোর ছেলেকেই দেবে তা'হলে।'

ভবতোষ চুপ করিয়া রহিল।

তারপর কি যে সে ভাবিল কে জানে ! দিনকতক পরেই একদিন সে অমরেশের কাছে গিয়া বলিল, 'আমি আজ একবার ছেলেটাকে দেখে আসি অমরেশ, কাজটা আমার কোনরকমে তুই চালিয়ে নিস্।'

'ছুটি নিয়েছিস ?'

ভবতোষ বলিল, 'হ্যাঁ।'

ভবতোষকে দেখিয়া প্রসন্নময়ী কন্যার জন্য খুব খানিকটা চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন। ভবতোষ কাঁদিল পশুপতিকে কোলে লইয়া। তাহার পর বৈকালের দিকে দেখা গেল, আবার সব শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। প্রসন্নময়ীও কাঁদিতেছেন না, ভবতোষের চোখেও আর জল নাই। কিন্তু কান্না থামিলেও ভবতোষের উদ্বেগ থামে নাই।

এই ঘরের চারিদিকে ভবানীর স্মৃতি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। উপরের ওই ঘরে বসিয়া তাহারা দুই স্বামী স্ত্রী কতদিন কত বিনিদ্ররজনী যাপন করিয়াছে, কতদিন কত দুঃখের প্রসঙ্গে ভবানীর চোখে জল আসিয়াছে, কত সুখের প্রসঙ্গে হাসিয়া সারা হইয়াছে। আজ আর তাহার সে হাসিও নাই, সে কান্নাও নাই। সমস্ত বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। কোথায় ভবানী ? কোথায় তাহার সে প্রিয়তমা পত্নী ?—যাহার জন্য শাশুড়ীর দুর্ব্যবহার সে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে !

আজ আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই ত' মানুষের জীবন ! এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের অহঙ্কার করিয়া কোনও লাভ নাই।

এখানে আর কিসের জন্য—কাহার জন্য ভবতোষ বেশিদিন থাকিবে ? পরদিন সকালেই সে তাহার শাশুড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ী মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'কি ?'

ভবতোষ বলিল, 'খোকাকে আমি নিয়ে যাব।'

এ কথা সে যে বলিতে পারে প্রসন্নময়ী তাহা ভাবেন নাই। হেঁটমুখে কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'হুঁ। তা নিয়ে যাবে বই-কি!'

ভবতোষ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দু'জনের সদ্ভাব কোন-দিনই নাই। আজ ভবানীর মৃত্যুর পর তাহাদের এতদিনের সঞ্চিত মনোমালিন্য হঠাৎ দূর হইয়া যাইবারও কথা নয়। প্রসন্নময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কি যে তাঁহার মনের ভাব ভবতোষ ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিল না।

সারাদিন ধরিয়া প্রসন্নময়ী চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঝির কাছে, চাকরের কাছে ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, 'খাইয়ে পরিয়ে এখন ওকে মানুষ করে তুলেছি কি-না, এখন নিয়ে যাবে বই কি! তা বেশত' যাক্ না, আমার কি! মেয়ের ছেলে—ধরে রাখতে চাইলেই-বা সে থাকবে কেন? ছোঁড়া আবার একটা বিয়ে করবে, থাকবে সেই সৎমার কাছে লাথি ঝাঁটা খেয়ে! ওরে ও কার্ত্তিক, বাবা তোকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, যা তোর বাবার সঙ্গে।'

ডাক শুনিয়া কার্ত্তিক কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ী ব[illegible]-লেন, 'যাবি?'

কার্ত্তিক বলিল, 'কোথায়?'

'তোর বাবার সঙ্গে?'

কার্ত্তিক তাহার এই মাতামহীর মুখে ভবতোষ সম্বন্ধে

অনেক কথাই শুনিয়াছে। শুনিয়াছে—বাবা তাহার মানুষ অত্যন্ত খারাপ। মা যে তাহার মরিয়াছে, সে শুধু তাহার এই বাবার জন্যই।

ঘাড় নাড়িয়া কার্ত্তিক বলিল, 'না আমি যাব না।'

সুমতি-ঝি কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'শোন্ সুমতি, ছেলে কি বলছে শোন্! এ-অবস্থায় আমি ওকে পাঠাই কেমন করে' বল্ দেখি?'

পাঠাইবার ইচ্ছা প্রসন্নময়ীর ছিল না। কিন্তু রাত্রে যখন ভবতোষ আবার সেই একই অনুযোগ লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, প্রসন্নময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলেকে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে যে বলছো—নিয়ে গিয়ে রাখবে কোথায়?'

ভবতোষ বলিল, 'নিজের কাছে।'

'নিজের কাছে? জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে, সার্কাসের তাঁবুতে?'

ভবতোষ বলিল, 'কেন? সার্কাসের তাঁবুতে মানুষ কি থাকে না?'

প্রসন্নময়ী হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'যাও, তোমার ছেলে তুমি নিয়ে যাও! নিয়ে যাও বলছি, এক্ষুণি নিয়ে যাও, আজ রাত্রেই নিয়ে যাও।'

ভবতোষ বুঝিল ইহা রাগের কথা। কিন্তু তাহার নিজের ছেলে, স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাই এই মাতৃহীন ছেলেটাকে কিছু-দিনের জন্য কাছে রাখিয়া স্ত্রীর শোকটা সে একটুখানি লাঘব করিতে চায়। শাশুড়ীর ইহাতে রাগ করা উচিত নয়। ভবতোষ

বলিল, 'আজ রাত্রে না হোক, কাল সকালে আমি ওকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।'

প্রসন্নময়ী আর কোনও কথা বলিলেন না। রাত্রে ছেলেটাকে নিজের কাছে শোয়াইয়া বারম্বার তিনি শুধু এই কথাটাই বলিতে লাগিলেন, 'আমাকে ছেড়ে তুই বেশ থাকবি, নয় কাত্তিক? পরের ছেলে নিজের কখনও হয় না। এক গাছের ছাল আর-এক গাছে কি লাগে কখনও!'

ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিতে প্রসন্নময়ীর বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে তিনি প্রাণপণে তাহা গোপন করিয়া ছোট একটি ট্রাঙ্কের ভিতর কাত্তিকের কাপড় জামা গুছাইয়া দিয়া ভবতোষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ভবতোষ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'সকাল ন'টার সময় ট্রেণ বলেছিলে না?'

ভবতোষ বলিল, 'হ্যাঁ। একটা ন'টায়, আর একটা এগারোটায়।'

প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'এগারোটায় আর গিয়ে কাজ নেই, ন'টাতেই যাও। তোমরা আমার চোখের সুমুখ থেকে দূর হয়ে গেলেই আমি বাঁচি, হাড়টা জুড়োয়।'

এই বলিয়া ট্রাঙ্কটা তিনি পায়ে করিয়া ভবতোষের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'এই ট্রাঙ্কে ওর কাপড়জামা আছে, ছেলেকে ডাকো, ডেকে যাও—দূর হও!'

প্রসন্নময়ী চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার

ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'কিন্তু এ-কথা যেন কোনদিনই ভেবো না ভবতোষ, যে, মাগী মরে' গেলে বাড়ীঘর বিষয়-সম্পত্তি সবই ওই ছেলেরই হবে। তা আর হচ্ছে না! সে-আশা করো না। এসব আমি দান করে' বিক্রি করে' উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাব, কাউকে এক কাণাকড়িও দিয়ে যাবো না। যাও আর দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমাদের দেখলে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে।'

ভবতোষ ডাকিল, 'খোকা! খোকা! পশুপতি! পশুপতি!'

এই বলিয়া সে এদিক-ওদিক সন্ধান করিতে লাগিল।

প্রসন্নময়ী দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলেন, 'পশুপতি! জানোয়ার কোথাকার!'

ছেলেটাকে লইয়া সত্যই ভবতোষ চলিয়া গেল।

পার্টি তখন কলিকাতায়।

সমস্ত রাস্তা ভবতোষ চাহিল পশুপতির মুখে একটুখানি হাসি আনিতে, কিন্তু ছেলেটা সেই যে আসিবার সময় হইতে মুখ ভারি করিয়া বসিয়া আছে, হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত তেমনি সে মুখ ভারি করিয়াই বসিয়া রহিল।

ভবতোষ তাহাকে কত কথা বলিতে লাগিল,—কত খেলার কথা, বাঘের কথা, সিংহের কথা, আরও কত বন্য হিংস্র জানোয়ারের কথা! কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হাসি তাহার মুখে একটিবারের জন্যও দেখা গেল না।

৩

অমরেশ বলিল, 'শেষ পর্য্যন্ত যা বললি তাই করলি ভবতোষ! কাজটা কিন্তু ভাল হ'লো না।'

ভবতোষ বলিল, 'ভাল মন্দ জানিনি ভাই। নিজের ছেলে নিজের কাছে এনে রাখলাম।'

'কিন্তু এই কি রাখবার জায়গা রে?'

'কেন, নয় কেন?' বলিয়া ভবতোষ অন্য কথা পাড়িল। অমরেশও সে-সম্বন্ধে আর-কিছু বলিতে পারিল না।

সেণ্ট্রাল এভিনিউ রাস্তার ধারে তাহাদের তখন তাঁবু পড়িয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে খেলা দেখান হয়। ভবতোষ আজকাল ট্রাপিজের খেলা না দেখাইয়া বাঘ-সিংহের খেলা দেখায়। ট্রাপিজের খেলা দেখাইবার ভার পড়িয়াছে অমরেশের উপর।

প্রত্যহ খেলার সময় পশুপতি একটি চেয়ারের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। খেলা যতক্ষণ চলে, ভবতোষের দিকে সে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। বিপদের মুহূর্ত্তে বুকের ভিতরটা তাহার দুরুদুরু করে। আবার বিপদটা যখন কাটিয়া যায়, ভবতোষের প্রশংসায় চারিদিক হইতে দর্শকেরা যখন চট্‌পট্ করিয়া হাততালি দিতে সুরু করে, পশুপতির বুকের ভিতরটা আনন্দে গর্ব্বে কেমন যেন ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে। প্রশংসমান দৃষ্টিতে বাবার মুখের পানে তাকাইতে গিয়া দেখে, ভবতোষও তাহার দিকে সহাস্যমুখেই তাকাইয়া আছে।

খেলা শেষ হইলে পশুপতিকে সঙ্গে লইয়া ভবতোষ চলিয়া যায়। তাহার মনিবের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ীর নীচের তলায় একখানি ঘর ছিল। ভবতোষের জন্য সেখানি তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভবতোষ, অমরেশ ও পশুপতি—তিনজনে তাহারা একত্রে বাস করে।

প্রসন্নময়ী বলিয়াছিলেন, 'তোর বাবা লোক ভাল নয়। তোর মা মরেছে শুধু তারই জন্যে।'

কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার মন হইতে ধীরে ধীরে সে চিন্তাটা অপসারিত হইয়া যাইতেছে। কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বাবা তাহাকে স্নেহ করেন।

পশুপতি প্রত্যহ তাহার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারটিতে গিয়া না বসিলে ভবতোষের খেলা দেখাইতে দেরি হয়। খেলা যেন সে শুধু তাহারই জন্য দেখায়। জন্তু-জানোয়ারের খেলা দেখিয়া পশুপতি আনন্দ পায় বলিয়া ভবতোষ আজকাল ট্রাপিজের খেলা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছে। বাঘ-সিংহের কত নূতন নূতন খেলা ভবতোষ আবিষ্কার করিয়াছে এবং আবিষ্কার করিয়াছে শুধু পশুপতির জন্য। পশুপতিই যেন তাহার একমাত্র দর্শক!

বাসায় ফিরিয়া গিয়া ছেলেকে খাওয়াইয়া নিজের হাতে পরিপাটি করিয়া তাহার বিছানাটি পাতিয়া দিয়া ভবতোষ বলে, 'আজ কেমন খেলা দেখলি পশুপতি?'

পশুপতি বলে, 'ভালো।'

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পশুপতি বলিতে থাকে, 'আজ কিন্তু সেই বড় বাঘটা দাঁত বের করে' যে-রকম ছুটে তোমাকে কামড়াতে এসেছিল বাবা, আমি ত' ভয়ে একেবারে—'

কথাটা তাহার শেষ হইল না। ভবতোষ হাসিতে লাগিল।

সে বড় আনন্দের হাসি।

বাঘটা তাহাকে কামড়াইতে আসিলে পশুপতির কষ্ট হয়।—তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে এতদিন ধরিয়া যে-সব কথা প্রসন্নময়ী ইহাকে শিখাইয়াছে, তাহা সে বিশ্বাস করে নাই!

তাহারই পাশের বিছানায় ভবতোষ শুইয়া পড়িয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁরে খোকা, তোর দিদিমা তোকে কি-সব বলতো রে? বলতো—তোর বাবাটা ভারি দুষ্টু, ভারি বজ্জাত—না?'

পশুপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'হুঁ।'

'আর-কি বলতো? বলতো তোর বাবার কাছে কখনো যাস্‌নি, না?'

'হুঁ।'

ভবতোষ বলিল, 'আমার ওপর রাগ করে' তোর দিদিমা তোকে কিছু দেবে না বলেছে। বলেছে, বিষয়-সম্পত্তি টাকা কড়ি সব সে অন্য-কাউকে দিয়ে দেবে। তা দিক্‌গে, মরুক্‌গে। আমরা গরীব মানুষ, গরীব হয়েই থাকব।'

কথাটা ভবতোষ তাহার ছেলেকে শুনাইবার নাম করিয়া যেন নিজেকেই শুনাইল।

পশুপতি সে কথার কোনও জবাব না দিয়া বলিল, 'দিদিমা বলে আমার মাকে তুমিই মেরে ফেলেছ।'

ছেলের মুখে তাহার মার নাম শুনিয়া ভবতোষের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল ভবানীকে। চোখ দুইটা সহসা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া পশুপতির গায়ে হাত দিয়া ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, 'মাকে তোর মনে পড়ে পশুপতি?'

পশুপতিরও অবস্থা বোধকরি তেমনই। তাহারও মুখ দিয়া কথা সহসা বাহির হইতে চাহিল না। খানিক্ পরে সে ধীরে ধীরে বলিল, 'হুঁ। একটু-একটু মনে পড়ে।'

তাহার পর দু'জনেই চুপ! কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। ভবানী তাহাদের দু'জনেরই বুকের ভিতর তখন তোলপাড় তুলিয়াছে!

অমরেশ এতক্ষণ দোতলার একটা ঘরে বসিয়া সার্কাসের মালিকের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতেই ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

ফট্ করিয়া ইলেকট্রিকের সুইচ্‌টা টিপিয়া আলো জ্বালিতেই দেখা গেল, অমরেশ।

অমরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বাপ-ব্যাটায় গল্প হচ্ছিল বুঝি?'

ভবতোষ বলিল, 'হ্যাঁ।'

অমরেশ বলিল, 'কিন্তু শোনো খোকা, এমন করে' শুধু সার্কাস দেখলে চলবে না, কাল থেকে রোজ সকালে উঠে আমার সঙ্গে ডন্-কুস্তি করতে হবে, আর ইস্কুলে একদিন ভর্ত্তি করে' দিয়ে আসবো, সেখানে রোজ পড়াশুনা করতে হবে।'

পশুপতি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ডন্-কুস্তি করব?'

অমরেশ বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, শরীরটাকে এমন করতে হবে, যাতে করে' রোগ-ব্যাধি জীবনে কখনও না হয়। আর তা যদি করতে পারো ত' বাস্, পৃথিবীর কোনও কষ্টই তখন আর কষ্ট বলে মনে হবে না।'

সার্কাসের পার্টি যখন বাহিরে চলিয়া যাইবে, সার্কাসের মালিক বলিলেন, 'পশুপতি তখন আমার বাড়ীতেই থাকবে। এখানে থেকে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখবে।'

ব্যবস্থা ভালই। ভবতোষ অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল।

অমরেশ কিন্তু যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল। তাহার পরদিন হইতেই অতি প্রত্যূষে পশুপতিকে তাহাদের কুস্তির আখ্ড়ায় লইয়া যাইতে লাগিল।

পশুপতির উৎসাহের অন্ত নাই।

অমরেশ খুশী হইয়া বলিল, 'বাঃ, এই ত' চাই! যেমন বাপ তেমনি তার ছেলে হতে হবে ত! কিন্তু বাবা, একটি কথা মনে রেখো। শরীরও ভাল করতে হবে, লেখাপড়াও শিখতে হবে।'

পশুপতি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'বেশ।' এবং সেই নিয়মেই

তাহার জন্য রুটিন তৈরি হইল। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া শরীরচর্চ্চা, বাড়ী ফিরিয়া স্নানাহার, তাহার পর স্কুল, স্কুলের ছুটির পর আবার একবার ডন-কুস্তি, সন্ধ্যায় পড়াশোনা, তাহার পর আহারাদি শেষ হইলে নিদ্রা।

. অমরেশ খুশী হইয়া একদিন ভবতোষকে বলিল, 'এই বয়স থেকে ছেলে যদি তোর নিয়মিত ব্যায়াম করতে থাকে ত' বড় হলে দেখবি—এই পশুপতিই হবে—বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবীর।'

কিন্তু কোন্‌দিক্ দিয়া কি যে হইয়া গেল কে জানে। মাসখানেক্ পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল, পশুপতি অসুখে পড়িয়াছে।

ছেলেব অসুখ দেখিয়া ভবতোষ ত' ভাবিয়া অস্থির!

অমরেশ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'ছেলে-মানুষ, অভ্যাস ত' নেই, কাজেই অসুখ-বিসুখ প্রথম প্রথম এখন এক-আধটু হবেই। ওর জন্যে ভাবিস্‌নি ভবতোষ।'

কিন্তু চার পাঁচ দিন ধরিয়া জ্বর যখন তাহার সমানে চলিতে লাগিল, তখন আর ভবতোষ একটুখানি না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না।

সার্কাস তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় রুগ্ন ছেলেকে বাসায় ফেলিয়া ভবতোষকে খেলার তাঁবুতে গিয়া খেলা দেখাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া ছেলের শিয়রের কাছটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

সে দিন সে খেলা দেখাইয়া ফিরিবার সময় একজন ডাক্তার

ডাকিয়া আনিল। রোগী দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, 'জ্বরটা ভাল নয়, একটুখানি সাবধানে রাখবেন।'

এই বলিয়া তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অমরেশ ফিরিতেই ভবতোষ তাহার কাছে গিয়া বলিল, 'তুই ঠিক কথাই বলেছিলি অমরেশ, এখানে আমরা থাকি সেই ভালো, ছেলেপুলে রাখবার জায়গা এ নয়।'

অমরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিয়া উঠিল শুধু তাহাকে সাহস দিবার জন্য। বলিল, 'কাল থেকে তোকে আর তাঁবুতে যেতে হবে না ভবতোষ। দু'টো কাজ দিন-কয়েকের জন্যে আমি একাই চালিয়ে নেব।'

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, 'পারবি ?'

'খুব পারবো।' বলিয়া অমরেশ আবার তাহাকে সাহস দিতে লাগিল! বলিল, 'কালকেই দেখবি ছেলে তোর ভাল হয়ে গেছে।'

কিন্তু ভাল সে সহজে হইল না।

এদিকে অমরেশ পড়িল মুস্কিলে। ট্রাপিজের খেলা দেখাইয়া বাঘ-সিংহের খেলা দেখানো যত সহজ ভাবিয়াছিল, দুদিন কাজ করিবার পর দেখিল তত সহজ নয়।

তখন সে এক বুদ্ধি ঠাওরাইল।

ভবতোষকে বলিলে রাজি সে কিছুতেই হইবে না। কাজেই সেদিন সে ভবতোষকে না জানাইয়া তাহার শাশুড়ী প্রসন্নময়ীকে একখানি চিঠি লিখিয়া দিল।

লিখিল :

গত কয়েকদিন হইতে পশুপতির ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। আপনি একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া এখান হইতে তাহাকে নিজের কাছে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। ছেলে দিবারাত্রি আপনার কাছে যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে। আপনার কাছে গেলেই সে সারিয়া উঠিবে। ইতি—

ভবতোষের একজন বন্ধু।

চিঠি পাইয়া প্রসন্নময়ী রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন। সুমতি ঝিকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, 'এই ছ্যাখ্, জামাইয়ের কাণ্ড ছ্যাখ্ সুমতি!'

সুমতি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে মা?'

প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! যা বলেছিলাম তাই হয়েছে। ছেলেটাকে জোর করে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে, নিয়ে গিয়ে তাকে মারবার ব্যবস্থা করেছে। তা মরুক্, আমার কি! আমি বাবা সে-রকম মেয়ে নই। কলকাতায় ছুটে গিয়ে নিয়ে আসবো, না? না গেলেই নয়! মরুক্ ওইখানে। জানবো—আমার মেয়েও ছিল না। মেয়ের ছেলেও ছিল না।'

এই বলিয়া চিঠিখানির দিকে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, 'নিজে চিঠি লিখতে পারেন নি, লিখিয়েছেন এক বন্ধুকে দিয়ে। আমার বয়ে গেল, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।'

সুমতি বলিল, 'না মা, রাগ করলে কি চলে? কার ওপর রাগ করছেন?'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, প্রসন্নময়ী তাহার মুখের পানে কট্‌মট্‌ করিয়া একবার তাকাইলেন। বলিলেন, 'তুই থাম্‌ সুমতি, তোকে আর উপদেশ দিতে হবে না। এখান থেকে যেদিন সে ছেলেকে নিয়ে গেছে সেইদিনই জেনেছি—ছেলে মরে গেছে। বিষয়-সম্পত্তি রাধামাধবের নামে লিখে রেখেছি, এইবার একদিন দলিলটে রেজেষ্ট্রী করে দিয়ে বৃন্দাবনে চলে যাব। বাস্‌।'

ইহার উপর আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। প্রসন্নময়ী সারাদিন ধরিয়া আপনমনেই গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর রাত্রিটা তাঁহার কাটিল শুধু ভবতোষকে গালাগালি দিয়া, আর ভবানীর জন্য গোপনে খানিকটা কাঁদিয়া।

পরদিন সকালে উঠিয়াই কি যে তিনি ভাবিলেন কে জানে, সুমতির কাছে গিয়া বলিলেন, 'নে ওঠ্‌ বাছা, ওঠ্‌ শীগ্‌গির, যা বলছি শোন্‌!'

সুমতি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'যা, দৌড়ে গিয়ে চাকরটাকে একটা গাড়ী ডাকতে বল্‌।'

'গাড়ী কি হবে মা?'

প্রসন্নময়ী রাগিয়া বলিলেন, 'তাও তোকে জান্‌তে হবে?'

সুমতি অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া গিয়া গাড়ী ডাকিতে গেল।

গাড়ী চড়িয়া প্রসন্নময়ী আসিলেন ষ্টেশনে। সুমতি তাহার সঙ্গে আসিল।

তাহার পর ট্রেণে চড়িয়া কোথায় যে তিনি চলিলেন সুমতি কিছু বুঝিতেও পারিল না, জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না।

শেষে গাড়ী যখন হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল তখন বুঝা গেল তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছে।

অমরেশের চিঠিতে ঠিকানা লেখা ছিল, সেই ঠিকানায় পৌছিয়া প্রসন্নময়ী এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

ভবতোষ তখন পশুপতিকে ঔষধ খাওয়াইতেছিল। প্রসন্নময়ী শয্যাপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন—নিশ্চল, নির্ব্বাক!

ভবতোষ তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া একটুখানি অবাক্ হইয়া গিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, প্রসন্নময়ী কথাটা তাহাকে বলিতে দিলেন না। সুমতি কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, গম্ভীরকণ্ঠে তাহাকে তিনি আদেশ করিলেন, 'নে, ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে—আয় আমার সঙ্গে!'

সুমতি আদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, পশুপতি বলিল, 'কোলে নিতে হবে না। আমি—'

বলিয়াই সে তাহার বাবার মুখের পানে একবার তাকাইল।

ভবতোষের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সুমতি তখন পশুপতিকে বিছানা হইতে কোলে তুলিয়া লইয়াছে।

প্রসন্নময়ী আর দাঁড়াইলেন না। বলিলেন, 'চল।'

বাহিরে মোটর দাঁড়াইয়াছিল। রোগী লইয়া তাহারা তাহাতেই গিয়া উঠিলেন। ভবতোষ তাহাদের পিছু-পিছু সদর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ী তাহাকে বোধকরি শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিলেন, 'খবরদার, আমার বাড়ী যেন কেউ আর না যায়। ছেলেকে যদি কেউ আনতে যায় ত' এবার আমি তাকে ঝাঁটা মেরে দূর করে দেবো। নাও চালাও, এবার চল— হাওড়া ষ্টেশন।'

ভবতোষ বলিল, 'কিন্তু কেমন থাকে একটা খবর…'

কথাটা তাহার শেষ হইল না। গাড়ী ছাড়িবার আওয়াজের তলায় তাহার কম্পিত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া গেল। সজলচক্ষে সেইখানেই সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাধা যে ছিল সে বিদায় হইয়া গেছে। রুগ্ন সন্তানের শয্যাপার্শ্বে এখন আর ভবতোষকে বসিয়া থাকিতে হয় না!

আবার সে তাহার কাজে যোগ দিয়াছে।

সমবেত দর্শকমণ্ডলীর ঘন ঘন করতালিধ্বনি আবার তাহাকে উৎসাহিত করিয়া তোলে, সর্ব্বশরীরের শিরায় শিরায় রক্ত যেন আবার চঞ্চল হইয়া ওঠে। ট্রাপিজের খেলা দেখাইয়াই তৎক্ষণ সে বাঘ-সিংহের লোহার দরজা খুলিয়া দিতে বলে।

কিন্তু সব মিথ্যা!

সুমুখে পশুপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট সেই চেয়ারখান খালি পড়িয়া আছে।

প্রসন্নময়ী দাঁত কিস্‌মিস্‌ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'পশুপতি! হুঁ বাপের ওপর এত টান্‌! তাও যদি বাপের মত বাপ হতেন!'

এই বলিয়া চিঠিখানা তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

* *

*

ওদিকে ভবতোষের মাথায় তখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। উঠিবার শক্তি নাই। বিছানায় শুইয়া শুইয়াই মাঝে-মাঝে সে ডাকিতেছে, 'খোকা! খোকা! খোকা এলো?'

অমরেশ বলিল, 'হ্যাঁ আসবে। আমি চিঠি দিয়েছি।'

ভবতোষের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। নীরবে শুধু সে একবার অমরেশের মুখের পানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ টেলিগ্রাম করিয়া জবাব পাওয়া যায় নাই, চিঠিতে কি হইবে?

চিঠি কিন্তু অমরেশ সত্যই লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল—পশুপতিকে।

লিখিয়াছিল: গিয়া অবধি তোমার কোনও সংবাদ পাই নাই। কেমন আছ লিখিবে। তোমার বাবার ভয়ানক অসুখ। নিজে সে লিখিতে পারিল না বলিয়া চিঠিখানি আমি লিখিলাম। ইতি

তোমার কাকাবাবু—অমরেশ।

সেই চিঠি গিয়া পড়িল পশুপতির হাতে।

প্রসন্নময়ীকে লুকাইয়া চিঠিখানি সে পড়িয়া দেখিল। দেখিল—

'ঙীর বাবার ভয়ানক অসুখ। নিজে সে লিখিতে পারিল না—'

আর বেশি পড়িবার প্রয়োজন হইল না। পশুপতির চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

প্রসন্নময়ী তাহার বাবার কাছে কখনই তাহাকে যাইতে দিবেন না, তাহা সে জানে। এখন উপায়?

পশুপতি ভাবিতে লাগিল—কি সে করিবে, কি তাহার করা উচিত।

বাবা তাহার টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, দিদিমা জবাব দেন নাই। সে নিজে লুকাইয়া তাহার বাবাকে একখানি চিঠি লিখিতে চাহিয়াছিল, তাহাও ত' তিনি কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। এখন আবার চিঠি আসিল—বাবার অসুখ!

পশুপতি ভাবিল, যেমন করিয়াই হোক্ তাহাকে সেখানে যাইতেই হইবে।

কিন্তু একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি পর্য্যন্ত যেখান হইতে সে পাঠাইতে পারে না, সেখান হইতে লুকাইয়া সে নিজে প[illegible]ইবে কেমন করিয়া!

প্রসন্নময়ী তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, তাঁহাকেও সে কম ভালবাসে না। কিন্তু তাই বলিয়া বাবার কাছে সে যাইতে পাইবে না, বাবাকে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত সে লিখিতে পারিবে না,—এ আবার কি রকম কথা!

পশুপতির মনের কাঁটাটা দাঁড়িপাল্লার মত একবার এদিকে একবার ওদিকে দুলিতে লাগিল। ঝোঁকটা অবশ্য তাহার কোনোদিকেই বেশি ছিল না। প্রসন্নময়ীর দিকেও যতখানি, তাহার বাবার দিকেও ততখানি। কিন্তু মানুষ যেখানে বাধা পায় সেইখানেই তাহার জেদ্‌ চাপিয়া যায়। পশুপতিরও ঠিক তাহাই হইল। প্রসন্নময়ীর কাছে বাধা পাইয়া মন তাহার বিদ্রোহ করিল। দাঁড়িপাল্লার কাঁটা তাহার বাবার দিকেই ঝুঁকিল বেশি।

কলিকাতায় যাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাহাকে কয়েকটি টাক সংগ্রহ করিতে হইবে, লুকাইয়া এ-বাড়ী হইতে পালাইয়া ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিতে হইবে, তাহার পর হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিয়া যেমন করিয়া হোক্‌ তাহার বাবার কাছে গিয়া পৌঁছিতে হইবে।

সুমতিকে সেদিন একা পাইয়া পশুপতি চুপি চুপি তাহাকে বলিল, 'তোমাকে একটা কথা বলবো, দিদিমাকেবলবে না বল।'

সুমতি বলিল, 'না বলবো না, তুমি বল।'

পশুপতি বলিব, 'আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর।'

সুমতি তাহাই করিল।

পশুপতি বলিল, 'আমাকে দুটি টাকা দেবে?'

সুমতি অবাক্‌ হইয়া গেল।—'দুটি টাকা? কি করবে?'

'আমি যা-ই করি, তুমি দেবে কি না বল।'

সুমতি বলিল, 'আমি টাকা কোথায় পাব বাছা! টাকা ত আমার কাছে নেই। তবে তোমার দিদিমার কাছ থেকে—'

দিদিমার নাম শুনিয়াই পশুপতি চমকিয়া উঠিল। 'না তোমাকে দিতে হবে না সুমতি। তুমি যেন দিদিমাকে কিছু বোলো না।'

পশুপতি দুইটি মাত্র টাকার জন্য বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়িল।

অবশেষে কোথাও কোনও পথ না পাইয়া সে এক ফন্দী ঠাওরাইল। প্রসন্নময়ী টাকা কোথায় রাখেন পশুপতি তাহা জানে। অনায়াসে দুইটি টাকা সে সেখান হইতে চুরি করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু চুরি করিবে?

বইএ পড়িয়াছে—না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা মহা পাপ।

চুরি করিতে প্রথমে তাহার মন চাহিল না।

পরে কোথাও আর কোনও পথ না পাইয়া মরীয়া হইয়া পশুপতি চুরিই করিল।

দুইটি টাকা চুরি করিয়া দিদিমাকে লুকাইয়া সেইদিনই সন্ধ্যায় সে কলিকাতার ট্রেণে চড়িয়া বসিল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রসন্নময়ী কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সুমতি অমরেশের লেখা সেই চিঠিখানা তাঁহার হাতের কাছে আনিয়া ধরিল। বলিল, 'এই চিঠিখানি ও-ঘরে পড়ে ছিল মা, এই দ্যাখো!'

প্রসন্নময়ীর বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। বলিলেন, 'ডাক্ একবার যোগেশকে, ডাক্ আমার কাছে।'